মোরুজিন

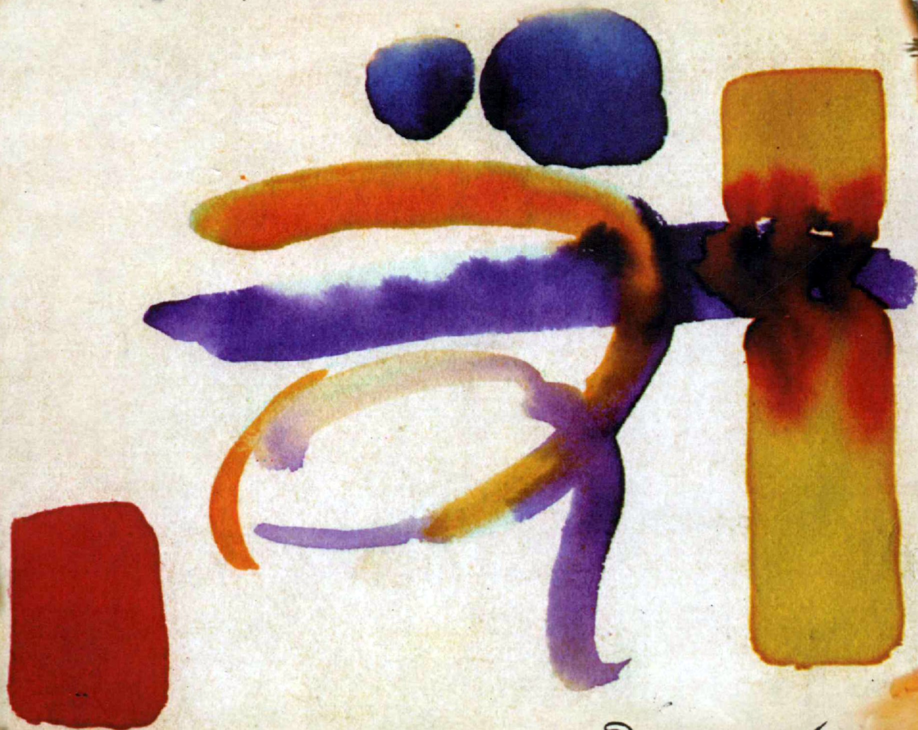

নীলাঞ্জন কর্মকার

মেরুজিন

নীলাঞ্জন কর্মকার

নির্জন স্বাক্ষর
কলকাতা

MERUJEEN
A Collection of Bengali Poems by
NILANJAN KARMAKAR

গ্রন্থস্বত্ব
নীলাঞ্জন কর্মকার

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা, ২০০৯

প্রকাশক
নির্জন স্বাক্ষর
৫০/৩এ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা -১২
দূরভাষ : ৯৪৭৪৩৬৮৭৯৩

মুদ্রক
গৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫ কানাই ধর লেন, কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সোমনাথ বসু ঠাকুর

প্রচ্ছদ ভাবনা
রাহুল চট্টোপাধ্যায়

ঋণ স্বীকার
নাসের হোসেন

দাম
৩৫ টাকা

উৎসর্গ

মা

বাবা

আর বাপ্পা-কে

স্মৃতির পথ ধরে একটি বিকেল হুইস্‌ল
দিতে দিতে চলে যায় ইডেন রোডের দিকে...
নিঃসাড় যুবক ধূসর শার্সির পাশ ঘেঁষে দেখে
দূরে, বহুদূর ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটি ঘুড়িই লাট খায় রোজ
মিলেমিশে যায় মায়াঘুম বনপথ ধরে...

আর, কে যেন ডাকে। সাদা পাৎলুন পরে
এ-ছাদ থেকে ও-ছাদ... ও-ছাদ থেকে সে-ছাদ...

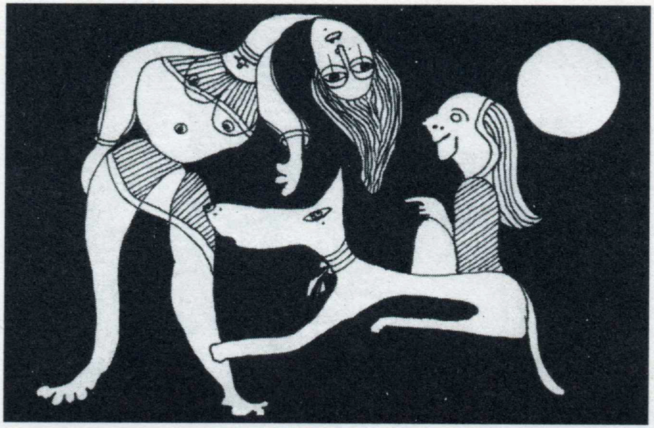

প্রতিটি যবশস্যের ভিতর এমন ইলেকট্রিক প্রদাহ
বহুকাল জীবিত রাখবে আমায়...
নিহত আখরোট-দানা ভেঙে ভেঙে শীতল
কিছুটা দুধ মিশিয়ে খেতে দিও, হ্যারিকেন-চাঁদ
বুঝি উলু দেয় ক্রমশ জ্বরের দিনগুলিতে।
এরপরও তামাক-চাহিদার মতো উঠে এসো
পম্পেই-নগরের স্বর্ণমুদ্রা হয়ে...
এই সাগু বার্লির বাটি থেকে খুঁজে নেব আমি
অস্থির চিরাগ প্রজ্বলন, অংশত বিবর্ণ-ব্যাধিময় যা কিছু।

মশারির দড়ি দুটি কোনাকুনি বেঁধে দিয়ে যাও।
আমি শুতে যাব হাইতি-উপকূল ধরে উলকাঁটার
গির্জায়...আয়ত করে দেখো মশারির ভিতর আমি
মোটরগাড়ি চেপে চলে যাওয়া মেয়েটির মতো
অস্থির হয়ে গেছি নিমজ্জনে।

এখন মশারিও তো কবরের মতো লাগে।
উলকাঁটা দুটি এনে ঠেকিয়ে দিলেই বুকের
সবুজ পাটাতন সরে যাবে। এই শীতে শীতল
শ্যাওলা-বুনন তুলে রেখো সোয়েটারে।

আমি ওইটুকুর জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

ভোর হলে আমি মায়ের পাশ থেকে উঠে চলে যাব
অনতিদূরে পেট্রলহীন লাঙলটির দিকে...
গ্রাম থেকে আনাজপাতিরা এসে ভিড়বে প্রত্যেক বাজারে
যেখানে একটি শিশু-নক্ষত্রের দ্র্যাব্যরসে চুবিয়ে নেবে
বুটপালিশের মোম। আমিও কৌটোর ভিতর থেকে উড়িয়ে
দেব বাণিজ্যের গাড়িটিকে। রুটি ও তরকারিময় চাষা দেখে
নেবে একটি মোরব্বা-বরফ ফেলে চলে যায় রাত্রের ট্রাকগুলি
কুয়াশাপ্রবণ হাইওয়ের দিকে, আর খামারবাড়ির গির্জা থেকে
ভেসে আসে শীতপোশাকের ভিন্ন-ভিন্ন প্রকল্প, যা আমি গত
রাত্তিরে মায়ের চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে দেখেছি
এবং পাশ ফিরে শুয়েছি প্রত্যুষের প্রথম মোরব্বার আশায়।

শুয়ে থাকি। অর্থহীন শুয়ে থাকি বিছানায়। কেউ বুঝি ভালোবাসার
উড়ান নিয়ে নামবে এই আধ ঘুমন্ত দেহপ্রসবের রোয়াকে।
নির্ণীয়মান ভালোবাসা চিরকাল লুকিয়ে থাকে ভাঙচুর স্কুলঘরগুলিতে...
দিগন্তের সর্ষেখেত ধরে যে ছেলে চলে গেছে শালুবন, বাঁশপাতা মাড়িয়ে
সনাতন ইউনিফর্মের লোভে, তার কি শুয়ে থাকা চলে?
আলোকিত রেলকামরায় যোজন সুন্দরীর দিকে চেয়ে থেকে দেখেছি
পায়েস ও লুচির গন্ধ ভেসে যায় ক্যাডিজ বন্দরে দাউ দাউ জাহাজের দিকে...
বড়ো ইচ্ছে হয় বিছানায় শুয়ে থেকে একটি বিমান উড়িয়ে
তোমাদের রাজ্যের দিকে চলে যাই, এক বিরাট ঘুমের সুযোগে।

হেমন্তের সকালে উঠে দেখি অবচেতনের দেবদারুগুলি
ঝুঁকে পড়েছে তোমাদের নিঝুম ঝুলবারান্দায়।
মাফিয়া-সর্দার হিসেব নিচ্ছে ওলন্দাজ নাবিকের অব্যর্থ
পায়রা-উড়ানের—আর কিছু নয়। যে জাহাজ এসে
ঠেকেছে ফিনাইল-কারখানার
কাছে সেখানে তো কোন নিমতলা নেই–বেঞ্চি
নেই–ডাক্তার নেই।
তবু বন্দরগুলিতে এমন ঘূর্ণি ওঠে কেন?
অবুঝ বুড়ি ভেজা কাপড় খুলে রেখে যায় জাহাজের
পাটাতনে, হয়রানির

ডলার গুনে নেয় কারখানার বন্ধুরা আর
পাউরুটি-ভ্যান টহল দিয়ে চলে জ্যোৎস্নায়। যে
ভাবে ভুটানি শালবিক্রেতা বিলিয়ে দেয় পাহাড়ি
সোয়েটার, মেশিনের গন্ধ।
আমাদেরও পতন-উন্মুখ সকালগুলি বেপথু ঘাসে
ভরে ওঠে– এঁটো বাসন ভেসে যায় কাকভোরে।
বিছানায় জেগে ওঠে অনন্ত স্বপ্নের ফার্ণপাতা আর
গামবুট পরে কে বা কারা ছড়িয়ে দেয় হৈ-চৈ
ফিনাইল বোতল।

শীতে ফ্যানের রেগুলেটর শূন্যে নুইয়ে থাকে। তোমার জানলা বিমুখ
চিরকালীন অনিদ্রার বাতাস এসে শোয় পাশটিতে আমার, শুনিয়ে যায়
ব্যগ্র বাঘটি চলে গেছে কাঁথা মুড়িয়ে সুলভ ট্রাভেলস্-এর গাড়িটির
চাকা ধরে কনভেন্ট স্কুলগুলির সুদৃশ্য বাথরুমে। আমাদের বোনেরা
মুখে সুপুরি গুঁজে বসে থাকে যেখানে দমকল এসে নিবিয়ে যায়
রেগুলেটর-এর শীতকালীন অধিবেশন ঘর।
আজ আর মা-কে ডাকিনি, বোনেদের ডাকিনি, বাঘেদের-ও ডাকিনি
অযথা শুধু অনিদ্রার প্রাচীন স্টোভ থেকে সোঁ-সোঁ আওয়াজ হয়।
পতাকা ওড়ে বিদ্যুৎপোস্টে।

এমন ঘরের প্রতি অনন্ত আহ্বান ছিল জীবনের। শ্বেতিময় চারপাশ, জাজিম পাতার নীচে ভোরের কুয়াশা খেলা করে আহত পারস্যঘোড়া হেঁটে যায় নিচুতলার বেশ্যাদের দিকে। লাগাম ধরে রেখো কিশোর, ফিরতে দিও না অভিসন্ধির নয়নাভিরাম বাগানে। কার্নিশে কার্নিশে যে বেড়াল হেঁটে যায় চন্দ্রাহত কাক ফুস করে উড়ে চলে ঠান্ডা জলার উপর দিয়ে...এসব ইঙ্গিত পাঠিয়েছি তোমায় একদিন। দেখো, আমরা জেগে থেকে বৃথাই সুতোর বল ছুড়ে দিচ্ছি ইঁদুরের গর্তে। বেকারির আঁচ পাওয়া পাঁউরুটিগুলি তুমি কোথায় লুকিয়েছো পাইন-যাজক? আমরা তো ছেড়ে যাব না এই আসবাব, পালঙ্ক বাজু, ধোপাদের ডিটারজেন্ট গন্ধ। ফেলে রেখে যাব শুধু ছদ্মনামগুলি কুয়োতলার ফলন্ত ফার্ণগুল্মে। আমাদের চিনে নিও হেমন্তে, গহ্বরমুখি উদাসীন পা বাড়ানোর দিনে।

হেমন্তের বারান্দায় এলে একটি সাদাফুলের সুগন্ধ ছুটে আসে তোমার ওষ্ঠ থেকে। আলপিনের আঘাতের মতো তীব্র ব্যথা পেয়ে একত্রিত ঝর্না ঘরে ঢুকে যাই চরাচর পেরিয়ে জর্জেট কারখানার কাছে। ওখানেই আমার বন্ধু কাজ করে। এখন তাকে বিরক্ত করি না। নিবিড় চাবি-যুগল শুধু রেখে গেছে। বলেছে, বেড়াতে যেতে। আমাদের ট্রেন তো কোথাও যাবে না কখনো। দাঁড়িয়ে থাকবে নিস্তব্ধ। তুমি ঠিক ফুলের ঝাঁপি নিয়ে উঠে যেও একাকী আপেল শহরের ট্রেনে। অনেক খেলা বুঝি বাকি আছে। রমণীয় কোনো পাল্লা খোলা থাকে দরজার, ভেজিয়ে দিও। আমাদের রেলকামরায় কোনো দরজা খোলা থাকেনি কখনও।

আমি খ্যাপা বাতাসের মতো ফাঁকা জেটির প্রান্তে গিয়ে বারংবার
গন্ধ নিই নিজস্ব রুমালের। দূরে ঠিকানাহীন চিঠিগুলি
ভেসে যায় স্রোতে। তোমার নিরাময়হীন গাড়িবারান্দার নীচে
একটি বালক সমানে গড়িয়ে দেয় ফুটবল। দৌড়ই সুঠাম সেনানীর
মতো নিজেকে প্রস্তুত রাখি বাঁ পাশে বল ঠেলে দিই। আর শাটারের
পাশে গনগনে উনুনের কাছে বসে ভাবি তোমার ছুটি-দিনের ব্যালকনি
ক্রমশ দিঘল এক ঘুমের দিকে ঠেলেছে আমায়। দেখেছি, অফিসফেরত
মানুষ কাতর শীতের রাতে ঢুকে গেছে বেশ্যাপাড়ায় আর আমার
নিজস্ব ফাঁকিগুলি ঝরে গেছে রুমাল থেকে জেটির কাছে।

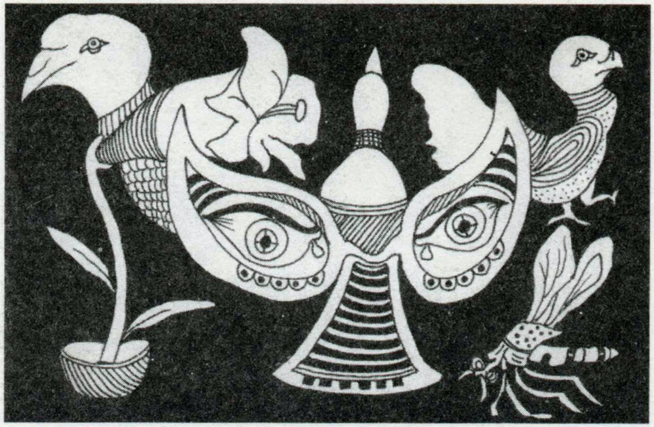

এবারের জন্মদিনে তুমি পায়েস রেঁধেছো, বকুল ? পাঠিয়েছো অচিন
মিশনারিগুলিতে ? এই জানলা বহুদিন খোলা হয়নি জানো ?
অপরিচ্ছন্ন সাঁকোয় মোমবাতি জ্বেলে দিয়েছে যে কিশোর আমি
তার জন্মদিন পালন করি এই বিছানায়। অন্ধকার র‍্যাকের
উপর ওল্টানো ধূপদানি খুঁজে পাওয়া ভীষণ শক্ত এই শীতে।
তবে, ধূপটুকু নিবে গেলে অনিদ্রার পরি এসে শুনিয়ে যাবে
সুপক্ব কাজু ও কিসমিস বাগানের কথা আর স্বপ্নের শীর্ষ
সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে যাবে তার সুবাস প্রাচীন মিশনারিগুলির দিকে।

জেগে থেকে কেউ বুঝি হুইলচেয়ার নিয়ে এগিয়ে আসে সনাক্ত করে দিতে হাত-পা-চিবুক। জন্মদিনের পাইনগুলির হাওয়ায় বুশ শার্ট ফুলে ওঠে, নীল হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটি একটি টেনিসবল বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিয়েছে প্রিয় লজেন্সের মতো।
আমরা মাছ হয়ে এসেছি, বসেছি বিছানায়। বকেদের ঠোঁট দেখেছি রৌদ্রছায়ায় আকাশের বিপুল জ্যোৎস্নায়... থমকিয়ে আছি। নিশ্চুপ হয়ে ফাঁকি দিয়েছি লেভেল ক্রসিং-এ বসে। শুধু হুইসল শুনে দীর্ঘতর হয়ে ঘুমিয়েছি বিছানায়। দেখেছি, যথাযথ শুলে পাদুটি চিরকাল একটু ঝুলেই থাকে বিছানার শেষে।

হেমন্তের সকালে দেখি ফিকে হয়ে আসে সুতো-কারখানার আকাশ। তুষারপথ ধরে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে ত্রস্ত রেলকামরা। এই তবে উদ্দাম গাড়ি ধোয়ার দিন! বন্ধু এসো এইখানে কার্নিভাল টাঙাই। ঘুমের অতল থেকে ছেড়ে যাও লাটাইহীন সুতোর রেশম কুড়িয়ে নিই এই বরফজ্যোৎস্নায়, ম্যাপ্‌ল গুঁড়ির নীচে। এসো যুক্তি করি—ধূপহীন মশারির ভিতর উলকাঁটা বুনে চলা পিসির নেওটা বিড়াল হয়ে ষড়যন্ত্রের কথা বলি। দূরে রেফারিহীন খেলার মাঠ বরফে আবৃত, কুয়াশার ভিতর থেকে ভেসে আসছে একটি ফুটবল আর অজস্র গোলকিপার ক্র্যাচ হাতে পাক খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে এখানে ওখানে। জমে যাচ্ছে কোলাহলের শিবিরে। এতসব বুঝতে পারার আগে এসো বন্ধু, কুশল বিনিময় করি— বলি কার্নিভাল—কার্নিভাল।

বিস্মিত হই, কেউ খুলে আছে কোনো কিশোরীর
শীতল মুখ বুকের কাছে শীতের রৌদ্রে।
আমি তো পারিনি ওভাবে লোহার শীতল সিঁড়ি
বেয়ে তেতলায় উঠে যেতে...
ঘর ভর্তি মানুষের মাঝে শুধু ভেবেছি আমি
সেতার বাজাতে জানি না। পিওন এলে চিঠি
নিয়ে দ্রুত উঠে গেছি ছাদে, দেখেছি একটি
শালিখ স্নান শিখিয়ে দিচ্ছে সুকোমল শিশুটিকে
তোমাদের উঠোনের টিপকলের জলে।

কি ভাবে এসেছিলাম এই দেশে। দেশান্তরের রেডিও শুধু ঘড়ঘড় আওয়াজ করে ওঠে...ফিরে যাব? ভোরের ফজর শেষে যেভাবে পাশতুন যুবা হেঁটে চলে ডুরান্ড-লাইন ধরে জমানো টাকার থলিতে দেখো পোড়া বারুদ ও মুজাহিদ খেলা করে। ক্ষুধার্ত ছাত্রেরা হামা দিয়ে উঠে আসে এক অলীক তোরণের কাছাকাছি আর বিদেশি ওয়াচ-টাওয়ার যেভাবে পেঁচা হয়ে যায়...ওই ন্যাপথা জাহাজের নাবিক ঘুমিয়ে রয়েছে গুটিসুটি পিঁপড়ের মতো পোর্টসাইড থেকে হাতছানি দেখি গ্রিক যুবতির মাথায় তার বজ্রপাতের টুনি জ্বলে সারারাত। বিস্মিত আয়নায় তারই লুটিয়ে পড়েছে মূর্ছার টেনিসবল।

দু-দশটা লোক বোধহয় হানা দেয় ঘটনাচক্রে কোনো। ফেলে যায় হিরাগানা লেপের ভিতর অনন্ত জ্যোৎস্নায় ফরাসি রুটির স্বেদ। একদেশ ছেড়ে অন্য দেশে গেলে পুরোনো জামার থেকে ঝুলে পড়ে বোতাম নিজেই। দু-দশটা লোক। দু-দশটা লোক বোধহয় জানে সবাই ঘুমিয়ে গেলে ইরানি গালিচার নীচে ঝিঁঝিপোকা ডেকে ওঠে দু-একবার। বিনিদ্র রেডিও-যন্ত্রের কাছে কেউ কান পেতে রাখে....

নিসর্গের নব ঘোরালে শুধুই ঘড়ঘড় আওয়াজ হয় মাঝরাতে।

আমাদের দারু-সমুদ্রের ভগ্ন শিকারাগুলি থেকে বারবার ধেয়ে গেছে
অপলক ফোন্‌কল আলোকিত বামনত্বের বাগানে। ভালো করে দেখো
একটি ব্রিটিশ হোমগার্ড কুকুরের সঙ্গে চলে গেছে শীতের দিনে, তার
পোশাকে গুঁজে রাখা শিভ্যাল্‌রি থেকে কবেই উধাও ঘোড়সওয়ার যুবতি।
তার কামিজ পড়ে আছে কোনো মেধার বাগানে।
এভাবে আর ক-দিন চলে বল? চেয়ে থেকে থেকে নৌকোর কাঠামোর
প্রতি লোভ দৃঢ় হয় তবু তুমি ব্যতীত যে-কোনো নারীর সঙ্গে ব্রিজের উপর
দাঁড়ালে আমার সংযম থেকে খসে পড়ে বিস্মৃত কিছু জেম্‌সক্লিপ—
এ কেবলই অন্ধকার শুঁড়িখানা থেকে কোমল বেড়ালছানা ছেড়ে দেওয়া
আমাদের যেমন ইঁদুরের গর্তের বাইরে ছুটির ব্যাঙ্ককর্মীরা রোদ্দুর নিতে
গিয়ে দেখে একটি যুবক হেঁটে চলেছে সোহরব-ব্যান্ডের পিছু পিছু
কার্ডহীন রেফারির মতো অমীমাংসিত ম্যাচের দিকে।

গভীর রাত হয়ে এলে তোমার কথাগুলি চন্দ্রাহত কাকের মতো
ভেসে যায় বিজাতীয় দলিলখানায় আর আমাদের নষ্টামিগুলি
আলোচনা করে নেয় কোনো শিকারি-যুবক।
আমাদের লোক লোকাচার বাদামখোলার মতো রয়েছে ছড়িয়ে
সোডার দীর্ঘ ফেনায়। সুদৃশ্য প্যারাফিন-লণ্ঠন নিয়ে উঠে
এসেছি শহরে, প্রতিলিপিহীন বীর্য ছড়িয়েছি অসাধু গাড়ি-বারান্দায়
যে গেরস্তের মেয়ে মুখ টুকু ধুয়ে রেখে গেছে অজিন বেসিনে অন্ধকার
টেরেসের উপর থেকে ঝরছে তার প্রাজ্ঞ চুল আর রিরংসার আঁশ।
অসম্ভব গিটারের দিনে জাপানি বেড়ার ধারে সাইকেল রেখে
ছুটে এসেছি, বলেছি : 'আমায় একটা দুটো চাকরি দেওয়া হোক'

বলেই মুখ থেকে পাইলটহীন বিমানে উঠে বসেছি নিসর্গের ডিভান পেতে। আমি তো দিতে চেয়েছি একগুচ্ছ সেফ্‌টিপিন শুচিবায়ু কোনো যুবতিকে আর পানশালা থেকে বেরিয়ে বমনের মধ্যে পেয়েছি একটি স্বর্ণশস্য তাকে কোথায় পুঁতবো বলে? কোথায় রাখব সিঁধ কেটে? এ-সব নিয়েই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে তোমায় ছুঁতে চাই আর সকালে উঠে বাথরুমে অনেকটা সময় দিয়ে ফেলি।

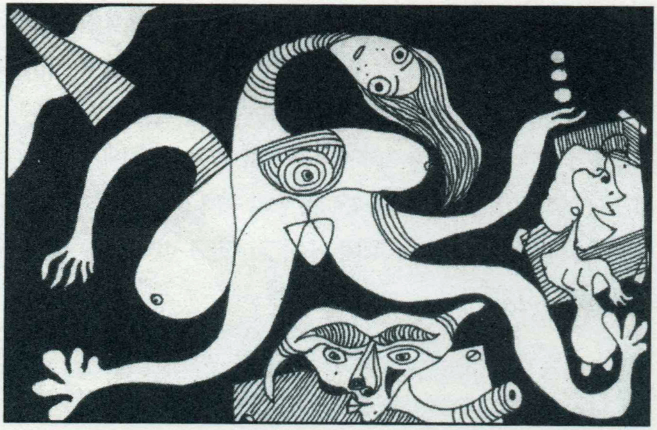

আইরিশ টেবিলের উপর বসে শ্যাওলাভুক মধ্যমায় আঙলি করছ ইদানীং। চকচকে ফ্লোরে নেমেছো স্টিমইঞ্জিনের মতো। আমার তো মনে নেই ভালোবাসা কতকালের নীরবমেঝেয় অদৃশ্য শুয়ে থাকে বুকের উপর। কিছুই আর বুঝে উঠতে পারি না। বাণিজ্য-ঘোড়ার কাছে রেখেছো খুলে বাবুইবাসার মতো বক্ষবন্ধনী। এতটুকু পিরিত বুঝলে না—আমারই লিগামেন্ট-ফ্রেমে অনন্য গঁদের আঠায় সেঁটেছি দেওয়ালময় তোমার অরক্ষিত জংঘা। তোমায় ভেবে ভেবে আর কতবার টেনে বেঁধে নেব খাটো পাজামা, পুরোনো ঘুলঘুলি থেকে বের করব হেমন্তের হলুদ চাদর... কে যেন আড়াল করে—কে যেন আঁধার করে মুখ। সারি সারি দমকল ভ্যান শুধু বলে গেছে নেমে এসো— নেমে এসো অনন্তের ছাদ ধরে। বন্ধু! এবার তবে নিশ্চিত ঝাঁপ দেব পাতালে না হোক তোমার তলপেটের কাছে নীলফুল ফুটে থাকে যেখানে অনেক।

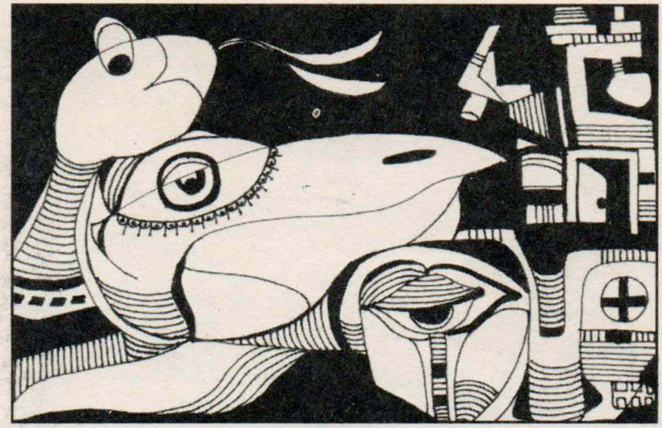

বিছানার উপর থাবা দিয়ে বসে আছে একটি নির্লোভ বিড়াল।
পশমের মতো গা থেকে ঝরছে তার ধূসর আঁশ
দূরে কাঁকড়-রাস্তা ধরে মসৃণ চলে গেল মিছিলের মানুষ।
এইটুকু দেখে হেঁটে হেঁটে আমি ঠিক পৌঁছে যাই তোমার
ঝুলবারান্দার নীচে। দেখি, তোমাদেরও টেলিফোন বেজে চলে...
পাশের আমলকী-গাছে কেউ উঠে যায় একটি সনাতন পতাকা
হাতে আর এসবের পরে ভেসে আসা শ্যাম্পুর গন্ধ নিতে নিতে
আমিও ঢুকে যাই কোনো সেলুন-পার্লারে।

শীত ঋতুর কাছে বসে থাকে মীনজাতকের ছায়া। একটি যুবক এসে হাত সেঁকে, কব্জির ভেতর থেকে বের করে লুকোনো ভালোবাসার চকমকি। তুমি তো জানো না দেশান্তরের পায়রা কতদিন ঘুরে মরে অলীক কার্নিশের লোভে...চেতনার নদী বেয়ে গড়িয়ে চলে বয়সহীন দু-একটি মার্বেল-পাথর। অঢেল ঘুমের মধ্যে তোমারও তো সিন্ধুক ভেঙে গয়না চুরি করে কেউ—দেখো ছায়ার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তুমিও শিখে ফেলছ এই প্রেত ভাষ্য। ভীষণ শীতের দিনে তুমিও কি চলে যাবে গভীর মাংসের লোভে? সপাট রৌদ্রে আগুন জ্বালবে কেউ আর ত্রিসীমানার বাইরে পলকহীন শিস দেব আমি। কপারখনির মতো ঠোঁট নিয়ে যে নদী শুয়ে থাকে শিশিরের গহিন শ্বাসের ভিতর আমি তাকে বারান* নামে ডাকি। উদভ্রান্ত চুমু দিয়ে ফেলি... চুমু দিয়ে ফেলি... আর চুমু দিয়ে ফেলি।

*বারান - পার্সি ভাষায় এর অর্থ বৃষ্টি। ইরানি চিত্রপরিচালক মাজিদ মাজিদি-র একটি ছবির নাম।

একদিন আমিও ঘর বন্ধ করে, সেরিন হাই তুলে ঘুমিয়ে যাই
তোমার খগোল বুকের উপর আর শ্বাস-চেপে টেলিফোন
করি দূরে গ্রামের বাড়িতে। খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে
পেস্ট্রির বাক্স খুঁটে নেয় কিশোরীর হাত, ধোঁয়াটে নীল
বারান্দায় গড়িয়ে যায় কারো বিয়ার-গ্লাস। কেউ যেন
স্মৃতির ভিতর মাফলার জড়িয়ে দেয়, গরম উলের
জামা এনে দেয় পাড়াতুতো বোন।
বহুদূরে ট্রাম চলে—বহুদূরে ট্রাম থেমে যায়
কোথাও শোরগোল নেই হল্লা নেই কোনো। শুধু শুনি
ভোরের কুয়াশার ভিতর তুমি হাঁটতে আসছো আবার...
অসহ্য টাইফয়েড নিয়ে বন্ধু উঠে বসছে বাড়ি ফেরার ট্রেনে।

এই নদী উপত্যকার গাছগুলিতে গত আশ্বিনের
ভায়োলিন বাঁধা আছে দেখে কুয়োতলা থেকে
গীতবাদ্যময় কাকগুলি ছুঁড়ে দিচ্ছে নিহত ইঁদুরজানু-বক্ষতল
আর বিষণ্ণ অজ্ঞতার লেখাগুলি হেঁটে যাচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীর
বাগানগুলিতে। যে পথ সোজা হয়ে গেছে মেয়েলোকটির
সিঁথির দিকে তাকে ডেকো না বন্ধু।
অতিসাবধানি পুরুষ যেমন ব্যক্তিগত রমণ সেরে উঠে বসে
মূক একটি ঠেলাগাড়ির উপর... তাকে আর খেলতে নিও না।
মনোশকটে উঠে যাওয়া রাজা যেন ভৃত্যটির কানে কানে বলে,
এই আশ্বিনমাস ক্রমশ পালক ঝরার দিন তারপর চলে যায়

উৎকোচপ্রিয় কোনো পাদ্রীর কাছে যেখানে জেগে থাকি আমরা
রাত্রিব্যাপী লুণ্ঠনমুদ্রণের হরফ আর সন্তপ্ত শস্যভূমিকায়।
ও-খুকু তাকিয়ে দেখো ঘরিঞ্চি কাঁধে মাচা-তৎপর গাছগুলিতে
বাসর জেগে সেই সব বন্ধুরা... উঠে এসো, উঠে এসো ক্রিসমাস
ক্যারল গেয়ে ওঠো এই বিষণ্ণ অজ্ঞতায় লেখাগুলির স্নানঘরের
কাছে আর আমাদের নিয়ে যাও স্বপ্নাতীত টিপসই দিয়ে।

যে মুঠির ভিতর ছিল অনন্ত স্ট্রবেরির দিন
ব্যাপটিস্ট মিশনের কাছে বন্ধক ছিল একাধিক
তামার চামচ... কিছুই ফেরতযোগ্য নয় জেনে
অন্ধকার ট্রেনের মধ্যে চড়ে বসি আজ, দেখি
খাঁড়ির গভীরে হাঁটুমুড়ে কে যেন বুনে চলে উলের পশম
আর ধোঁয়া ওঠা চাপনিস থেকে নামব কি নামব না
ভেবে, একদিন কমলা আলোয় দুটি শিশু একটিই পপিন্স
ভাগ করে নেয় গ্রানাইট-গলির ধারে।
আমায় কি ভুলেছ ওগো বার্সেৎনার ? নির্জন কেল্লার
থেকে আর্ত হাসির প্যাডেল ঘুরতে দেখেছি অনেক...
কফি খেত পেরিয়ে পাইন-বেড়ার কাছে ছিল আমাদেরও

তুলোচাষ কিছু। দূরে স্ট্রবেরি-বাগান থেকে হাতছানি
দেয় লাল রিবনের মেয়ে আর পার্টিক্লাস শেষ হলে
ফিরে আসে সান্ধ্যট্রেন।
কিছুতো ফেরতযোগ্য নয় বন্ধু, অহেতু মেলে ধরি চামড়ার
পোশাক থেকে দুটি হাত। একদিন স্থাপত্যের ভিতর অন্ধ হয়ে
ঢুকে যাব বিষণ্ণ গম্বুজে... আমায় ভুলো না বার্সেৎনার
যে মুঠির ভিতর ছিল অনন্ত স্ট্রবেরির দিন তারই
ট্রাম্পেট বাজাও হুইস্‌ল বাজাও
শুনি!

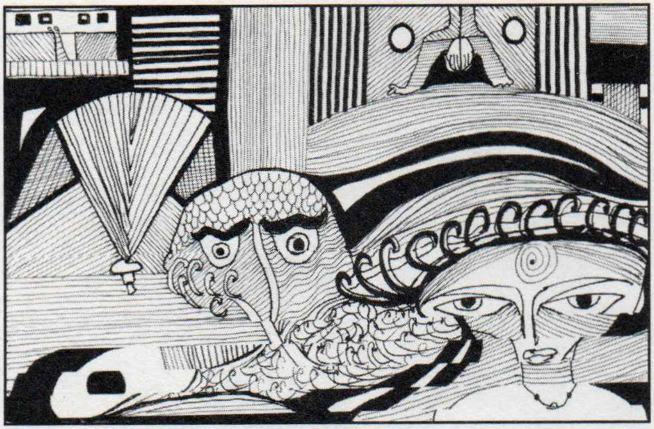

এভাবেই হয়ত শুয়ে থাকব। দু-হাজার চুয়ান্ন সালে ৩০শে সেপ্টেম্বর
আমি এভাবেই থাকব জেনে দেখো দু-হাজার আটের
এই ফাঁকা দুপুরে ধড়ফড় করে উঠে বসি। বাইরে অবিশ্রান্ত
বৃষ্টি ও রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে নবদম্পতির নহবত ঢুকে যায় তেতলায়;
একটি বেকার বন্ধুও বেতারযন্ত্রের মতো বেজে বেজে উঠে যায়
সিঁড়ি বেয়ে, শূন্যে থমকে থাকে প্রাচীন কেটলির অবৈধ নৈশপ্রহর...
তামাক সেবনের পর অ্যানাক্যাসুরিনা বাজিয়ে চলেছে যে মাড়োয়ারি
মোটরকার কমলা আলোয় তাদেরই সঙ্গিনী হয়ে উঠে গেছো
জৈন রোডের হোটেলে। সমস্ত উৎসব থেকে নিজস্ব মুদ্রাদোষ
রেখেছি সরিয়ে, পেয়েছি নশ্বর এক শয়নযান। আমার তো চুষিকাঠি
ছিল না কোনোদিন, তোমার পদযুগল আমি ঘুঙুর সমেত

পুষেছি জিহ্বায়। আমারই মুখ নিয়ে ঘুরেছ অলিগলি।
মক্ষিরানি সেজে বসেছো রুমাল হাতে তিব্বতি টিলার উপর।
দেখো হাওয়াকল পেরিয়ে, আতাবাগান পেরিয়ে ছুটে আসছে
রুগ্‌ণ কিশোরীর আঙুলের মত বিদায়ধ্বনি।
আমি শুধু এই ভেবে ঘুমিয়েছি, দু-হাজার চুয়ান্ন সালে
৩০শে সেপ্টেম্বর উঠে যাব ঠিক নিরাময়হীন প্রণয়ের মতো
সেই বিবাগী ধোঁয়ায়...

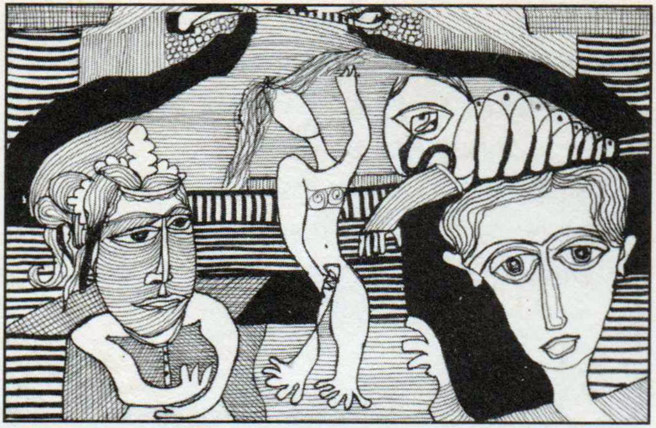

গভীর ঘুমের ভিতর একদিন নীলাঞ্জন নামে
একটি যুবক মরে যাবে। আর তাকে কফিনে মুড়ে
তালাবন্ধ করে একটি স্মারক-চাবি রেখে দেওয়া হবে
কফিনের পাশে। আসল চাবিটি ছুঁড়ে দেবে কেউ
ধু-ধু ঝাউবনের দিকে... শোকস্তব্ধ মিনার উঠবে একদিন।
তোমরা সবাই দেখতে আসবে তাকে
স্ট্র-হ্যাট পরে। খুলে রাখবে পাশে। দূর থেকে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখবে আর বলবে —ওই যে, ওই চাবিটির
রুপোলি নিয়ে এখনও সে ঘুমিয়ে আছে জানো ?
গভীর ঘুমের ভিতর নীলাঞ্জন নামে একটি
কফিন শুয়ে আছে।

নির্জন স্বাক্ষর

প্রয়াস